সাইবারজয়া: এশিয়ার সিলিকন ভ্যালি

ড. মাহাথির মোহাম্মদের মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোরের স্বপ্নটি তৈরি হয়েছিল অ্যামেরিকায় গিয়ে। ক্যালিফোর্নিয়ার সিলিকন ভ্যালি দেখে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নেন তাঁর দেশেও এমন একটি সিলিকন ভ্যালি গড়ে তুলবেন। যা দেখে বিশ্বখ্যাত সব কোম্পানি মালয়েশিয়ায় বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবে। আর এশিয়ার শীর্ষস্থানীয় আইটি কোম্পানিগুলো সিলিকন ভ্যালির দিকে না দৌড়ে মালয়েশিয়ায় আসবে। মাহাথীর মোহাম্মদের স্বপ্ন অনেকটাই পুরণ হয়েছে, বাকিটা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সুনশান নীরবতার মাঝে আইটি

কুয়ালালামপুর থেকে ট্রেনে ঘণ্টাখানেকের পথ সাইবারজয়া। ছোট-বড় পাহাড় ঘেরা শুনশান এই শহরটিকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর (এমএসসি)। এইখানে রয়েছে বিশ্বখ্যাত অনেক কোম্পানির ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট এবং গবেষণা কেন্দ্র। যেসব আইটি কোম্পানি মালয়েশিয়ায় বিনিয়োগ করতে আগ্রহী তাদেরকে একটি আইন মানতে হয়– তাদের অফিস কিংবা প্ল্যান্ট বা গবেষণা কেন্দ্র সবকিছুই করতে হবে সাইবারজয়ায়। বিদেশী কোন আইটি কোম্পানিই কুয়ালালামপুরে অফিস খুলতে পারবে না। পুত্রজয়াকে যেমন বলা হয় ক্যাপিটাল সিটি তেমনি সাইবারজয়া হচ্ছে আইটি সিটি।

সাইবারজয়াকে তৈরি করা হচ্ছে অ্যামেরিকার সিলিকন ভ্যালির আদলে। মালয়েশিয়া সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে আগামী ২০২০ সালের মধ্যে শহরটিকে বিশ্বের অন্যতম প্রযুক্তির শহরে রূপান্তরিত করা। ইতোমধ্যেই সনি এরিকসন, অ্যালকাটেল, নোকিয়া বা ইন্টেলের মত কোম্পানিগুলো তাদের ম্যানুফ্যাকচারিং ল্যাব বা রিসার্চ সেন্টার স্থাপন করেছে এখানে।

মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোরের সব কার্যক্রম পরিচালনা করছে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া মাল্টিমিডিয়া ইউনিভার্সিটি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে বেশ কিছু বাঙালি ছাত্র-ছাত্রী এবং কয়েকজন বাঙালি প্রভাষক। যাদের গৌরবদীপ্ত সাফল্য বিদেশের মাটিতে বাঙালির মর্যাদা বাড়াচ্ছে।

মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর! আসলে কী?

মালয়েশিয়া সরকার এমএসসিকে পরিচিত করে তুলছে বিশ্বব্যাপী। কুয়ালালামপুর বিমানবন্দর পেরোনোর পরে রাস্তায় অনেক জায়গাতেই রয়েছে স্বাগতম সূচক বিলবোর্ড। যার কয়েকটিতে `Welcome to Multimedia Super Corridor'. এমএসসি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয় মালয়েশিয়া মাল্টিমিডিয়া ইউনিভার্সিটি'র ব্যবস্থাপনা বিষয়ের প্রভাষক ড. আহাসানুল হক বেলালের কাছে। তিনি জানান, 'মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর নাম দেয়ার পেছনে মূল কারণ ক্রিয়েটিভ মাল্টিমিডিয়া। এদেশের সরকার শুধু হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারই নয়– তারা মাল্টিমিডিয়াকেও একটি শক্তিশালী আইটি খাত হিসেবে গণ্য করছে। আর মাল্টিমিডিয়া সংক্রান্ত সকল কাজ করা হবে এই করিডোরের মাধ্যমে। ধরুন ইয়াহু! ওয়েবসাইটের কথা। একটু খেয়াল করলেই দেখবেন এই তথ্যগুলো কিন্তু মাল্টিমিডিয়া পদ্ধতিতেই যাচ্ছে। ইয়াহু ওয়েব সাইটে বিভিন্ন অ্যানিমেশন রয়েছে, শব্দ রয়েছে আবার অ্যানিমেটেড বিজ্ঞাপনও। কিংবা একটি টিভি বিজ্ঞাপনেও কিন্তু মাল্টিমিডিয়া। তো হার্ডওয়্যার হোক, প্রকৌশল হোক আর ক্রিয়েটিভ মাল্টিমিডিয়া গ্রাফিক্স, অ্যানিমেশন বা ফিল্মের স্পেশাল ইফেক্টসই হোক সবকিছুই মূলত এই করিডোর থেকে অর্থাৎ মাল্টিমিডিয়া হয়েই যাচ্ছে।'

তবে প্রচলিত মাল্টিমিডিয়ার চেয়ে এই এমএসসি কিছুটা ভিন্ন। সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার, ইঞ্জিনিয়ারিং, টেলিযোগাযোগ, ক্রিয়েটিভ মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি সব নিয়েই মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর।

এমএসসি স্ট্যাটাস পেতে হলে রয়েছে বেশ কিছু শর্ত। এসব শর্ত যেসব আইটি কোম্পানি, বিশ্ববিদ্যালয় বা রিসার্চ সেন্টার পুরণ করতে পারে তাদেরকে এমএসসি স্ট্যাটাস কোম্পানি বলা হয়।

মালয়েশিয়া মাল্টিমিডিয়া ইউনিভার্সিটি

মাল্টিমিডিয়া ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস দুটো– সাইবারজয়া এবং মালাইকায়। এর মধ্যে ৮০ হেক্টর জায়গার উপরে শুধু সাইবারজয়া ক্যাম্পাস তৈরিতেই গেছে ৩৫০ মিলিয়ন রিঙ্গিত (বাংলাদেশী মুদ্রামানে প্রায় ৫৬০ কোটি টাকা!)। প্রযুক্তির সর্বশেষ সুবিধা সম্বলিত এই ক্যাম্পাস। এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে হাই স্পিড এটিএম, মাল্টিমিডিয়া লার্নিং ফ্যাসিলিটিজ, ইন্টেলিজেন্ট বিল্ডিং সিস্টেম্স, ইলেকট্রনিক গভর্ন্যান্স, ডিজিটাল লাইব্রেরি এবং একটি ইন্টিগ্রেটেড ক্যাম্পাস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। ক্যাম্পাসে মোট চারটি ফ্যাকাল্টি– ফ্যাকাল্টি অভ ক্রিয়েটিভ মাল্টিমিডিয়া, ফ্যাকাল্টি অভ ইঞ্জিনিয়ারিং, ফ্যাকাল্টি অভ ম্যানেজমেন্ট এবং ফ্যাকাল্টি অভ ইনফর্মেশন টেকনোলজি। মজার ব্যাপার হচ্ছে এতকিছু করার পর মালয়েশিয়া মাল্টিমিডিয়া ইউনিভার্সিটি সেদেশের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে সরকারের অনুমোদন পায়! এসব দেখেশুনে মনে পড়লো আমাদের দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কথা!

ঢাকার ছেলে আলী তাওয়াব জীম পড়ছেন ফ্যাকাল্টি অভ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ইলেকট্রিক্যাল সেকশনে, এবছর মে সেমেস্টারে ভর্তি হয়েছেন। 'অনেক বেশি মানসম্পন্ন শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে এদেশে। এরা টেকনিক্যালি ভীষণ অগ্রসর। প্রায় পুরোটাই ইউরোপীয় ধাঁচের। কিন্তু ইউরোপের তুলনায় এখানে খরচ অনেক কম। আর এমএমইউ-র সঙ্গে ইউরোপ, অ্যামেরিকা এবং ক্যানাডার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ রয়েছে। আমাদের সিলেবাসও ম্যাচ করে রাখা হয় ইউরোপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। ফলে আমরা যেকোন সময় এখান থেকে সেসব দেশে ক্রেডিট ট্র্যান্সফার করতে পারি। এখানকার সব শিক্ষকই উচ্চশিক্ষিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এখানকার রিসার্চ ল্যাব। বিশ্বের সর্বশেষ প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় ঘটছে আমাদের। দেশে বসে এধরনের সুবিধা পাওয়া সম্ভব নয়', একনাগাড়ে বলে গেলেন জীম। পড়াশুনা শেষে দেশে ফিরবেন কী? 'আমরা যা শিখছি দেশে যদি তার কোন ভাল চাকরি থাকে তাহলে অবশ্যই দেশে যাবো। তবে এখানে অনেক বহুজাতিক কোম্পানি রয়েছে। ভালোভাবে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করতে পারলে এখানেই হতে পারে। না হলে অন্য কোন দেশে চেষ্টা করবো।'

সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে এমএমইউ

এমএমইউ-র সুবিধা নিয়ে লিখলে পাতার পর পাতাই শেষ হবে। তবে ছোটখাট কিছু সমস্যা তো রয়েছেই। ফ্যাকাল্টি অভ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর টেলিকমিউনিকেশনের রাফি জানান, 'নিখাদ প্রযুক্তির শহর বলে সাইবারজয়ায় বিনোদনের ব্যবস্থা সীমিত। এছাড়া বাঙালির খাবার নিয়ে যে সমস্যা তার কিছুটাও আছে। বেশিরভাগ খাদ্যই কিনে খেতে হয়। আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে শিক্ষকদের লেকচার বুঝতেও মাঝে মাঝে সমস্যা হয়। কারণ এখানে বিভিন্ন দেশের শিক্ষক আছেন। একেক টিচারের লেকচার স্টাইল একেক রকম। এছাড়া তেমন কোন সমস্যা নেই আমাদের।'

আরেক বাঙালি ছাত্র তাকিউর বললেন হোস্টেল জীবন সম্পর্কে, 'এখানে হোস্টেলেও ল্যান (লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক) আছে। আমরা হাই স্পিড ইন্টারনেট ব্যবহার করে সবসময় দেশের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারছি। এছাড়া আমাদের লেকচার নোট, অ্যাসাইনমেন্ট, কোর্স ম্যাটেরিয়ালও পাওয়া যায় অনলাইনে। ফলে পড়াশুনা অনেকটাই সহজ হয়ে যায় আমাদের কাছে। তবে হোস্টেলে খরচ কিছুটা বেশি। তাছাড়া রান্না-বান্নারও সমস্যা। রুমে কোন রাইস কুকার রাখতে পারি না। ধরা পড়লে ফাইন দিতে হবে। জামা-কাপড় ধোয়া বা আয়রন করারও কোন ব্যবস্থা নেই রুমে। রুমে আয়রন রাখলেও ফাইন! আবার লন্ড্রি সার্ভিসে অনেক খরচ। এসব কারণে আমরা অনেক সময় বাইরে ফ্ল্যাট ভাড়া করেও থাকি। সেক্ষেত্রে খরচ কিছুটা কম হয়।'

আরেকটি বড় সমস্যার কথা জানালেন ফাহিম, 'কথা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইমিগ্রেশনের সব ব্যবস্থা করা হবে এবং আমাদেরকে এক বছর মেয়াদী মাল্টিপ্‌ল ভিসা দেয়া হবে। কিন্তু আমরা কেউই মাল্টিপ্‌ল ভিসা পাইনি। আমাদেরকে প্রথমে তিন মাস মেয়াদী একটি সিঙ্গল এন্ট্রি ভিসা দেয়া হয়। এরপর মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে পুনরায় একবছর মেয়াদী সিঙ্গল এন্ট্রি ভিসা দেয়া হয়। এজন্য চাইলেও দেশে যাওয়া বেশ দুরূহ হয়ে যায়। আর দেশে যাওয়ার পর ফিরে আসার সময় নতুন করে ভিসা নিতে হয়।'

পিছিয়ে নেই মেয়েরাও

বাংলাদেশী তিনজন ছাত্রীও আছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। এদের একজনকে পাওয়া গেল এমএমইউ'র লাইব্রেরিতে। ২০০৩ সালে বাংলাদেশ থেকে বৃত্তি নিয়ে এমএমইউতে এসেছেন খন্দকার মুনিরা মাহফুজ। পড়ছেন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে। তার মতে, 'এখানকার সবকিছুই অত্যাধুনিক। শিক্ষাব্যবস্থা পুরোটাই অনলাইনভিত্তিক। এছাড়া একজন মেয়ের জন্যে এখানে নিরাপত্তা বা অন্য কোন ব্যাপারে কোন সমস্যাই নেই। বরং ক্ষেত্রবিশেষে ছেলেদের চেয়ে আমরা সুবিধেও কিছু বেশি পাই।'

ফিরে আসা

সবকিছু দেখে একটা প্রশ্নই বার বার মনে আসে, বাংলাদেশে কী এমন উন্নয়ন সম্ভব নয়? একসময় মালয়েশিয়ার অবস্থা ছিল আমাদের মতই। তারা এখন নতুন নতুন প্রযুক্তি আবিস্কার করছে, নতুন প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করছে। আর আমরা শুধু প্রযুক্তির তলানি কুড়াচ্ছি। তবে গুণীরা বলেন, যদি একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগোনো যায় তবে বাংলাদেশেও সম্ভব এমন উন্নয়ন। গুনীদের কথা কী ফলবে নাকি শুধুই দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে যেতে হবে?

❑ মো. আরাফাতুল ইসলাম

মালয়েশিয়া থেকে ফিরে